পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার স্বরূপ

শক্তিপদ ত্রিপুরা, সভাপতি, খাগড়াছড়ি জেলা হেডম্যান এসোসিয়েশন

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের সমতল এলাকার ভূমি ব্যবস্থাপনা থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও প্রথা-পদ্ধতি দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিচালিত। ভূমির পরিমানের দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের এক দশমাংশ হলেও এ অঞ্চলে চাষযোগ্য ও বাসযোগ্য ভূমির পরিমান অত্যন্ত কম। চাষযোগ্য ও বাসযোগ্য ভূমির স্বল্পতা, আদিবাসীদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনা করে বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসন বহির্ভূত অঞ্চল ঘোষণা করে এ অঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তিদের স্থায়ীভাবে বসবাসে নিষিদ্ধ করেছিলেন। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও তাদের অস্তিত্ব রক্ষার এক রক্ষাকবচ ছিল। এই রক্ষাকবচ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে রহিত করা হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানাভাবে এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। পার্শবর্তী দেশ ভারতেও এর যথার্থ প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। ভারতের অরুণাচল, মিজোরাম, মেঘালয় ইত্যাদি রাজ্যে, রাজ্যের বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তি ভূমির মালিকানাস্বত্ব অধিকার পায় না। এমনকি রাজ্যের বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তি অরুণাচল, মিজোরাম রাজ্যে প্রবেশ করতে চাইলে রাজ্যের কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হয়। ভারতের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এখনো এ ধরণের আইন ও ব্যবস্থা রয়েছে যা আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিতান্ত জরুরী। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এই রক্ষাকবচ (শাসন বহির্ভূত অঞ্চল) রহিত হবার কারণে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অস্তিত্ব বিপন্ন এবং আদিবাসীরা প্রতিনিয়ত পিতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে।

দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকারের সনদ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে স্থায়ী বাঙালীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের জন্য ভূমির অধিকারসহ শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অধিকার সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়িত না হবার কারণে আদিবাসীরা তাদের ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া এবং প্রশাসন সর্বদা সেটেলার ও ভূমি দস্যুদের পক্ষালম্বন করার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাঙালী ও আদিবাসী উভয়ই নিজ ভূমি থেকে প্রতিনিয়ত উচ্ছেদ হচ্ছে।

ভূমি সমস্যার কারণ

১. আইন ও প্রথা অমান্য করা- পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার প্রধান কারণ হলো- সরকার বা সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন ও প্রথা অনুসৃত না হওয়া। সরকার বা সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথা ও আইনের ভিত্তিতে ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতো তাহলে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা এতো প্রকট আকার ধারণ করতো না। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন ও প্রথা লংঘন করে আদিবাসীদের হাজার হাজার একর ভূমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সেটেলারদের নামে লীজ ও বন্দোবস্তী প্রদান করেছে যা এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রধান সমস্যা হিসেবে পরিচিহ্নিত হয়ে আছে।

২. দৃষ্টিভঙ্গীগত সমস্যা- শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভংগী সাম্প্রদায়িক। আইন ও পলিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত বেশীরভাগ ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন।
উপরন্তু, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভাল লোকদের পোষ্টিং দেয়া হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক পোষ্টিং হয়ে থাকে। বেশীরভাগ আমলা পার্বত্য চট্টগ্রামে আসলে উগ্র সাম্প্রদায়িক হয়ে যান। উগ্র সাম্প্রদায়িক মানসিকতার কারণে আমলাদেরকে সর্বদা সেটেলারদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা যায়।

আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব আজ বিপন্ন- এই বিষয়টি দেশের অধিকাংশ মানুষ বুঝতে চায় না। আদিবাসীদের এই ভাষা, সংস্কৃতি ও তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার ক্ষেত্রে সরকার ও দেশের মানুষের দায়িত্ব রয়েছে- এ বিষয়টিও অনেকেই বুঝতে চায়না। উপরন্তু আদিবাসীদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে- এ ধরণের চিন্তা-চেতনা ও কার্যকলাপই প্রায়শ:ই পরিলক্ষিত হয়। বলে- আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জায়গা জমি ক্রয় করতে পারবো না কেন? এটি তার নাগরিক

অধিকারের দৃষ্টিভংগী। তবে তার এ অধিকারের দৃষ্টিভংগী সংকীর্ণ ও দায়িত্বহীন দৃষ্টিভংগী এবং সম্প্রসারণবাদী দৃষ্টিভংগী। অধিকারের দায়িত্বহীন দৃষ্টিভংগী, নিজের অধিকার প্রয়োগের সময় অপরের অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে কি না তা বিবেচনায় নেয়া হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢালাওভাবে জায়গার মালিক হয়ে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলা কোনভাবেই দায়িত্বশীল অধিকারের দৃষ্টিভংগী সমর্থন করে না। অধিকারের দায়িত্বশীল দৃষ্টিভংগী, অপরের অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে কি না তা সর্বদা বিবেচনা রেখে নিজের অধিকার প্রয়োগ করে।

৩. স্বীকৃতি না থাকা- আদিবাসীরা এদেশের নাগরিক হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি নেই। শাসকগোষ্ঠীর মনোভূমিতেও আদিবাসীদের স্বীকৃতি নেই। তাই এদেশে আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠীর কোন মাথাব্যথা নেই। এটি যে একটি বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু ধর্মের দেশ তারা বাস্তবে মেনে নিতে চায় না। শাসকগোষ্ঠীর প্রতিটি কার্যকলাপে এই দৃষ্টিভংগীর প্রমাণ মেলে। বরং তারা মনে করে এদেশ বাংলাদেশ, বাঙালীর দেশ, এদেশে একমাত্র বাঙালীরাই থাকবে- তারা এটিই মনে করে। তাই এদেশের আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব টিকে থাকবে কি থাকবে না তাদের বিবেচনার বিষয় নয়।

৪. রক্ষকই ভক্ষক: সরকার ও সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব হলো জনগণের জান মাল রক্ষা করা। কিন্তু যারা জনগণের জান মাল রক্ষক তারা যদি ভক্ষক হয় আদিবাসীরা যাবে কোথায়? বহু সামরিক-বেসামরিক আমলা আদিবাসীদের জীবন জীবিকার একমাত্র অবলম্বন যে জুম ভূমি, সে জুম ভূমি লীজ নিয়ে তারা আদিবাসীদের ভূমি বেদখল করে চলেছে।

৫. ভূল ধারণা: বাংলাদেশে যারা আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করে তারা মনে করে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের এক দশমাংশ ভূমি নিয়ে গঠিত। সে তুলনায় সেখানে জনসংখ্যা কম, তাই সেখানে আরো লক্ষ লক্ষ লোক পুনর্বাসন বা বসবাস করা যাবে। দেশের সাধারণ মানুষেরও তাই ধারণা। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তব অবস্থা হলো- এখানে বাসযোগ্য ও চাষযোগ্য জমির পরিমান অত্যন্ত। কানাডিয়ান সংস্থার জরীপ অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাষযোগ্য ভূমির পরিমান মাত্র **১৪৪,৩৩৭ একর** যা মাথাপিছু জমির পরিমান দাঁড়ায় ০.১৬ একর। অপরদিকে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু ভূমির পরিমান হলো ০.২০ একর।

নিম্নে কানাডিয়ান কোম্পানী কর্তৃক জরীপকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সংক্রান্ত একটি চিত্র প্রদান করা হলো-
১৯৬৪-৬৬ সনে কানাডার ফরেস্টল ফরেষ্ট্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারন্যাশন্যাল লিমিটেড এর ভূমি জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির ধরন ও পরিমাণ নিম্নরূপ-

শ্রেণী	ভূমির ধরণ	শতাংশ
এ	কৃষি জমি	৩.১%
বি	ঢালু জমি	২.৭%
সি	উদ্যানচাষ উপযোগী জমি	১৪.৭%
ডি	শুধুমাত্র বনায়নে উপযোগী	৭২.৯%
সি-ডি	বন বাগান উপযোগী	১.৩%
-	বাস্তুভিটা	-
-	জল ও নদী - নালা	৫.৩%
-	মোট	১০০%

উপরোক্ত তথ্যানুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ আত্যন্ত কম। এ ও বি শ্রেণীর জমিগুলো যদি সব ক'টি ধরা হয় তাহলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫.৮%। তম্মধ্যে ধান্য জমির পরিমাণ মাত্র ৩.১% তথা ৭৬,৪৬৬ একর। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা যদি সরকারী উদ্যোগে বসতি প্রদানকারী রাজনৈতিক অভিবাসীদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আদিবাসী জুম্ম ও পুরোনবস্তী স্থায়ী বাঙ্গালী মিলে একত্রে ৯ লক্ষ স্থায়ী অধিবাসী ধরা হয় তাহলে তাদের মধ্যে মাথাপিছু ধান্য জমির পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ০.০৮ একর। এছাড়াও এ ও বি শ্রেণীর জমিগুলো যদি একত্র করলে মোট ভূমির পরিমাণ দাড়াঁয় ১৪৪,৩৩৭ একর যা ৯ লক্ষ লোকের মাথাপিছু জমির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ০.১৬ একর (ধানী ও ঢালু জমি মিলে)। অথচ সমগ্র বাংলাদেশেও মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.২০ একর।

ভূমি সমস্যার চিত্র

ভূমির উপর থেকে আদিবাসীদের অধিকার হরণের সূত্রপাত ঘটে বৃটিশ আমলে। এসময় হাজার হাজার একর জুমভূমির উপর বৃটিশ সরকার সেগুনের বাগান গড়ে তুলে যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। তথাপি বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'শাসন বহির্ভূত

অঞ্চল' ঘোষণা এবং কতিপয় আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের ভূমি সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলো। পাকিস্তান সরকার বৃটিশ প্রণীত আইন লংঘন করে এবং পরবর্তীতে এ আইন বাতিল করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের অভিবাসন ঘটায় এবং আদিবাসীদের জমিতে তাদের পুনর্বাসন করে। এরপর বাংলাদেশ আমলে জিয়া রহমানের শাসনকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৪ লক্ষাধিক বাঙালীকে সরকারীভাবে অভিবাসন ঘটানো হয়। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধের মূল কারণ হলো এই অভিবাসন। নিম্নে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি-

১. সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা

১৮৭০ সালের দিকে আদিবাসীদের জুমভূমি, গো-চারণভূমি ও সমষ্টিগত ভূমি ও বনাঞ্চলকে 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল' ঘোষণা করা হয়। এর ফলে হাজার হাজার একর জুমভূমি আদিবাসীদের হাতছাড়া হয়ে যায়। হাজার হাজার একর জায়গায় বিদেশী এবং এক জাতের বৃক্ষ (সেগুন গাছ) রোপনের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রানীকূল, বন ও পরিবেশের জন্য তা অপূরনীয় এক মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনে। এটি শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, সারা বাংলাদেশের পরিবেশের জন্যও এক বড় ধরণের বিপর্যয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

২. কর্ণফুলী নদীর উপর কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন

পাকিস্তান আমলে ১৯৬০ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে ৫৪ হাজার একর পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে উর্বর ধানী জমি সম্পূর্ণরূপে জলে নিমজ্জিত হয় এবং এতে লক্ষাধিক আদিবাসী উদ্বাস্তু হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশ কিছু স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালীও এতে উদ্বাস্তু হয়। বাঁধ নির্মাণের কারণে অধিকাংশ উর্বর জমি জলমগ্ন হওয়ার ফলশ্রুতিতে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেংগে পড়ে। পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই বাঁধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী পরিবারদের ভূমি সংকটের কারণে পুরোদমে পুনর্বাসন করতে পারেনি।

৩. সেটেলার বাঙালী পুনর্বাসন

১৯৭৯-১৯৮৬ সালের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারীভাবে চার লক্ষাধিক বাঙালী অভিবাসন করা হয় । এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী ও বাঙালীর মধ্যে সহিংস ঘটনার সূত্রপাত ঘটে এবং এতে লক্ষাধিক আদিবাসী উদ্বাস্তু হয়। বাঙালী বসতিস্থাপনকারীরা এ সুযোগে পাহাড়ী আদিবাসীদের ভূমি দখল করে নেয়। আদিবাসীদের শত শত একর ভূমি বসতিস্থাপনকারীরা বেদখল করে।

সরকার এসব সেটেলার বাঙালীকে জায়গা জমি প্রদানসহ পুনর্বাসনের প্রলোভন দেখিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসে। সরকার সেটেলার বাঙালীর প্রতিটি পরিবারকে নিম্নোক্ত হারে জমি প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে-

ক্রমিক নং	একক	জমির পরিমান / টাকার পরিমান	জমির ধরণ
১	পরিবার প্রতি	২.৫ একর	সমতল কৃষি জমি
২	পরিবার প্রতি	৪ একর	মিশ্র জমি
৩	পরিবার প্রতি	৫ একর	পাহাড়ী জমি
৪	পরিবার প্রতি	এককালীন ৫০০ টাকা	মাসিক ২০০ টাকা ও ১২ সের খাদ্যশস্য

সরকারের প্রথম সভায় ৩০,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসনের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সরকার ৮০,০০০ পরিবারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করে। ৮০ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন করলে জমির পরিমান দাঁড়ায়-

ক্রমিক নং	জমির ধরণ ও পরিমান	জমির ধরণ	মোট জমির পরিমান
১	২.৫ একর x ৮০,০০০ পরিবার	কৃষি জমি	২০০,০০০ একর
২	৪ একর x৮০,০০০ পরিবার	মিশ্র জমি	৩২০,০০০ একর
৩	৫ একর x ৮০,০০০ পরিবার	পাহাড় জমি	৪০০,০০০ একর

পাকিস্তান সরকার ভূমির সংকটের জন্য কাপ্তাই বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ভূমির পরিবর্তে ভূমি প্রদানের কথা থাকলেও প্রতিশ্রতি মোতাবেক ভূমি দিতে পারেনি। অথচ জিয়া সরকার লক্ষ লক্ষ একর ভূমি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অসহায় ও নিরীহ বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসিত করে। ফলশ্রুতিতে যা হবার তাই হয়েছে। বর্তমানে ভূমি বিরোধের কারণে পাহাড়ী-বাঙালীর মধ্যে প্রায়শ: সহিংস ঘটনা ঘটছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বড় বড় যে সব হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল সবই ভূমি বিরোধকে কেন্দ্র করেই হয়েছিলো।

৪. নূতন সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা

১৯৯২ সালে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয় কর্তৃক নূতন সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা আদিবাসীদের জন্য আর একটি বড় মাপের বিপর্যয়। এ ধরণের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণার মোট জমির পরিমান প্রায় ৮৯,০৩৪ হেক্টর। নূতন সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণার সবটিই আদিবাসীদের জুমভূমি। এতে আরেকবার জুমিয়া চাষীরা বড় ধরণের ক্ষতির শিকার হয়। এর ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার আদিবাসী জুমিয়া পরিবারের জুমভূমি হাতছাড়া হয়ে যায় এবং আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক জীবনে মারাত্মক বিপর্যয় বয়ে আনে।

৫. শিল্পভিত্তিক ভূমি ইজারা

বানিজ্যিক ভিত্তিক ফলজ ও বনজ বাগান, রাবার চাষ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য শত শত একর ভূমি ইজারা প্রদান করা হচ্ছে। জমি ইজারা দানের মধ্য দিয়েও পাহাড়ী জুমিয়ারা তাদের জুম ও সমষ্টিগত ভূমি হারাচ্ছে।

৬. সেনা বাহিনীর ব্যবহারের জন্য ভূমি বেদখল

সেনাবাহিনী তাদের ক্যান্টনমেন্ট ও ক্যাম্প সম্প্রসারণ, সেনা গ্যারিসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদির জন্য আদিবাসীদের জুম ও সমষ্টিগত মালিকানাধীন বন ও ভূমি অধিগ্রহন করছে। এ কাজের জন্য সেনাবাহিনী আদিবাসীদের হাজার হাজার একর জমি দখল করতে চলেছে। এসব হাজার হাজার একর জমি দখল করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের হাজার হাজার আদিবাসী নিজেদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হবে।

৭. আমলাসহ বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক ভূমি বেদখল

জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ বিভিন্ন আমলা ও ব্যক্তির নামে আদিবাসীদের ভূমি বেদখল করা হয়েছে ও হচ্ছে। এ ধরণের বেদখলের ভূমির পরিমানও হাজার হাজার একর হবে।

৮. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীর নামে ভূমি বেদখল

জিবি হর্টিকালচার সেন্টার, ডেসটিনি, গ্লোব কোম্পানী, কসমিক খামার লিমিটেড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন আদিবসী জুমভূমি, সমষ্টিগত মালিকানাধীন জমি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদিবাসী ব্যক্তির নামে বন্দোবস্তীকৃত জমি বেদল করে বাগান বাগিচা করছে।

ভূমি কমিশন আইন, ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান কর্তৃক ভূমি জরীপ ঘোষণা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান কমিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেই ভূমি জরীপের ঘোষণা দেন, যা ভূমি কমিশনের কাজ নয়। ভূমি কমিশনের আইনে এ সংক্রান্ত কোন কিছু উল্লেখ নেই। সুতরাং ভূমি জরীপ করা বা ভূমি জরীপ ঘোষণা কোনটিই ভূমি কমিশনের এখতিয়ারাধীন নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে স্পষ্টই উল্লেখ রয়েছে যে, ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি করার পর সরকার আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা করে ভূমি জরীপ সম্পন্ন করবেন। তাই ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির আগে ভূমি জরীপ করা কোনভাবে চুক্তিসম্মত হতে পারে না। ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান কমিশনের অন্যতম সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান ও তিন রাজার সাথে আলোচনা না করে একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আইন বহির্ভূত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ভূমি কমিশন চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির বিপরীতে ভূমি সমস্যাকে জটিল করে তুলছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করার জন্য উস্কানীমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংগঠন ও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে এক জোরালো ভূমিকা পালন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সুপারিশমালা

১. আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল' হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা;

২. পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি আদিবাসী / উপজাতীয় অধ্যুষিত হিসেবে এর বৈশিষ্ট্য সংরক্ষনার্থে সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন করা;

৩. ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য অচিরেই আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন- ২০০১ এর চুক্তি বিরোধাত্মক ধারাসমূহ সংশোধন করা;

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি করা ও ভূমি জরীপ করা করা;

৫. ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন চেয়ারম্যান কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন রাজার সাথে আলোচনাক্রমে কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৬. পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন মোতাবেক 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা;

৭. আদিবাসীদের বেদখলকৃত ভূমি আদিবাসীদের নিকট ফেরত প্রদান করা;

৮. আইন, বিধি, পদ্ধতি, রীতি ও প্রথা অনুসরণ না করে যে সব ভূমি লীজ ও বন্দোবস্তী প্রদান করা হয়েছে তা বাতিল করা এবং এসব জমি প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তর করা;

৯. নূতন রিজার্ভ ফরেষ্ট ঘোষণা বাতিল করা (২ লক্ষ ১৮ হাজার একর) এবং বন আইন সংশোধন করা;

১০. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আই এল ও কনভেনশন- ১০৭ বাস্তবায়ন করা এবং আই এল ও কনভেনশন- ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করা;

১১. অঙ্গীকার মোতাবেক যথাশীঘ্র সম্ভব সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা;

উপসংহার:
পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি অন্যতম সমস্যা হলো ভূমি সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হবার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার সমাধান হতে পারছে না। বর্তমান সরকার এই চুক্তি সম্পাদন করেছিলো। এই চুক্তি বাস্তবায়ন করা তারই দায়িত্ব। সরকার গঠনের পর বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের কথা বলেছে। নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতেও এই চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা হয়েছিলো। সুতরাং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা সরকারেরই দায়িত্ব। চুক্তি বাস্তবায়ন না হবার কারণে সৃষ্ট যে কোন সমস্যারও দায়-দায়িত্ব সরকারের। ইতিহাস সেদিকেই ধাবিত হচ্ছে।